OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 159 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 159 - 163
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘দিবারাত্রির কাব্য’ ও ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন

প্রিয়াঙ্কা কুণ্ড
Email ID: kundupriyanka125@gmail.com
iD 0009-0003-1423-8765

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Psychological complexity, imagery, evocations of nature, song, authorial intent, characterization.

Abstract

Cinema is created through the convergence of imagery, motion, and sound. A film serves to present a narrative—that is to say, cinema is a medium for storytelling. Since the task of storytelling is also intrinsic to the novel, cinema has frequently turned to novels to fulfill its narrative requirements. Numerous films have been produced based on the plots of various novels by a diverse range of authors. Indeed, many films have been adapted from the novels written by Manik Bandyopadhyay. In this essay, we will discuss the cinematic adaptations of two of his novels: ‘Dibaratrir Kabya’ and ‘Padma Nadir Majhi’.

The film ‘Dibaratrir Kabya’ directed by Bimal Bhowmik and Narayan Chakraborty, employs a number of extraordinary visual motifs. The screenplay, choreographic movements, and musical arrangements within this film effectively and beautifully convey the author’s original intent. In 1993, Goutam Ghosh directed a film based on ‘Padma Nadir Majhi’ — one of Manik Bandyopadhyay’s renowned regional novels. To narrate the story in this film, Ghosh chose to focus on the destitute rural populace, their authentic environment, and the river Padma itself. Through the lens of the camera, various scenes are rendered with exquisite precision on the screen. The acting prowess of the cast, the utilization of diverse visual imagery, and the incorporation of music collectively elevate the film to a distinct artistic dimension. Both cinematic adaptations prove to be highly successful; through a process of selection, omission, and creative reinterpretation, these two films effectively capture and convey the underlying spirit and intent of Manik Bandyopadhyay’s novels.

Discussion

ক্যামেরার সাহায্যে বাস্তবজীবনের দৃশ্য পর্দায় ফুটিয়ে তোলে চলচ্চিত্র বা সিনেমা। সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিল্পকলার একটি সমন্বিত রূপ হল চলচ্চিত্র। বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম, যেমন— নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা থেকে এক-একটি উপাদান গ্রহণ করে তা সুন্দরভাবে আত্মস্থ করে এক নবীন শিল্প রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে চলচ্চিত্র। উনবিংশ

শতকের শেষ বা বিংশ শতকের শুরুতে এই শিল্পের পথচলা শুরু। আর মাত্র এক শতাব্দীতেই চলচ্চিত্র নিজেকে পরিণত ও প্রাপ্তমনস্ক শিল্পমাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর একটি শিল্প-সাহিত্য। সাহিত্যের একটি অনুরূপ হল উপন্যাস। উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের অনেক অমিল থাকলেও একটি বৈশিষ্ট্যে তারা একাত্ম হয়েছে; তা হল গল্প বলা। লেখকের কলমের আঁচড়ে মানবজীবনের যে দৈনন্দিন রূপ অঙ্কিত হয় উপন্যাসে, সেই রূপই কিছুটা সংযোজন, বিয়োজন ও পরিসৃজনের মাধ্যমে ক্যামেরার দৃশ্যায়নে চলচ্চিত্রের শৈল্পিকতাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন পৃথিবীব্যাপী মানবিক মূল্যবোধের যে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের লেখনীতে নতুন বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সংগ্রাম, সমাজের কৃত্রিমতা ও জটিলতা, নিয়তিবাদ, বৈজ্ঞানিক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ— এই সবই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য বিষয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তাঁর উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র। আমরা তাঁর রচিত ‘দিবারাত্রির কাব্য’ ও ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের আলোচনা করবো। ১৯৩৫ সালে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিবারাত্রির কাব্য’ একটি জনপ্রিয় ও কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় ১৯৭০ সালে, করেন পরিচালক বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী।[১] এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় তিনটি ভাগে বিভক্ত — প্রথম ভাগ, দিনের কবিতা; দ্বিতীয় ভাগ, রাতের কবিতা; তৃতীয় ভাগ, দিবারাত্রির কাব্য। প্রথম ভাগে আমরা পাই হেরম্ব, সুপ্রিয়া, অশোক, মতিলাল ও বীরসা চরিত্রগুলিকে। সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়েছে রূপাইকুড়া থানার দারোগা অশোকের সঙ্গে। সুপ্রিয়া হেরম্বকে ভালোবাসত বিয়ের আগে থেকেই এবং আজও ভালোবাসে। হেরম্বের অনুরোধেই সুপ্রিয়া বিবাহ করে। বিয়ের ছয় বছর পর হেরম্ব সুপ্রিয়ার ঘরে অতিথি হয়ে আসে। অতিথির সেবা করতে প্রস্তুতির বিরাম নেই সুপ্রিয়ার। সুপ্রিয়া যে আজও হেরম্বের প্রতি অনুরক্ত তা সে প্রকাশ করে। কিন্তু, হেরম্ব নির্লিপ্ত। সুপ্রিয়ার প্রেমের দাবিতে সায় না দিয়ে ছয় মাসের সময় নিয়ে হেরম্ব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

মনোজটিলতার আরেকটি রূপ প্রকাশিত হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসে পথিমধ্যে অনাথের সাথে সাক্ষাৎ হয় হেরম্বের। হেরম্ব মালতী বউদিকে দেখার জন্য অনাথের সাথে তাদের বাড়ি যায় এবং সেখানে দেখা হয় অনাথ ও মালতীর একমাত্র কন্যা অষ্টাদশী আনন্দের সাথে। প্রকৃতিমুখর, সৃজন-উন্মুখ আনন্দ বিছিয়ে রেখেছে ভালোবাসার অবাধ জমিন। এই ভালোবাসায় হেরম্ব নিজেকে আবিষ্কার করে এবং আনন্দের ভালোবাসার কাঙাল হয়ে ওঠে ভালোবাসা-বিমুখ হেরম্ব।

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের এক চমৎকার রূপ প্রকাশিত হয়েছে উক্ত উপন্যাসের তৃতীয় ভাগে। একই সঙ্গে, সুপ্রিয়া ও আনন্দের সাথে এক প্রেমের চিত্র দেখা যায় দ্বিধাগ্রস্ত হেরম্বের মধ্যে। একদিকে সুপ্রিয়ার আকুলতা অন্যদিকে আনন্দের আবেদন — এই দুই-এর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় হেরম্বের মধ্যে। শেষে আনন্দ তার প্রেমকে চিরস্থায়ী করতে আগুনে আত্মাহুতি দেয়।

বহুপঠিত জনপ্রিয় উপন্যাসের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী বেশ কিছু চরিত্রের ও দৃশ্যের সংযোজন করেছেন, আবার কিছু ঘটনা বর্জনও করেছেন। বীরসাকে অপরাধী হিসেবে দেখানোর জন্য তার স্ত্রীয়ের মৃতদেহ ও কিছু গ্রামের লোক,[২] আবার বীরসাকে ধরবার সময় অশোক ছাড়া আরও কিছু পুলিশ অফিসারকে দেখানো হয়েছে।[৩] অনাথের সাথে দেখা হওয়ার আগে সমুদ্রের জনবহুল দৃশ্য দেখানো হয়েছে।[৪] তবে, সিনেমাটি কোনোভাবেই উপন্যাসের অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে যায়নি। উপন্যাসের প্রথমে দেখানো গ্রামের দৃশ্য ও ‘কিষণ’ চরিত্রটি খুব স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্রে উপস্থিত নেই।[৫] আবার এই চলচ্চিত্রটিকে দর্শকের মনে মর্মস্পর্শী ও ভাববাহী করার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত “ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্র খানি” ব্যবহার করা হয়েছে,[৬] যা চলচ্চিত্রে খুব সংগত হয়েছে।

এখানে সুপ্রিয়ার গানটি গাওয়ার সাথে কিছু অসাধারণ চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে, যা চলচ্চিত্রে এক অনবদ্য সংযোজন হয়ে আছে। সুপ্রিয়া জেনে গেছে, হেরম্ব শুধু একদিনের জন্য তার বাড়িতে অতিথি হয়েছে। সে চলে যাবে রাত পোহালেই। গানটি গাওয়ার দৃশ্যে সুপ্রিয়া কুয়োর ধারে থাকে এবং তার প্রতিচ্ছবি পড়ে কুয়োর জলে।[৭] কুয়োর জলে তার

প্রতিচ্ছবিটিকে ক্যামেরাম্যান তাঁর ক্যামেরা উল্টো করে দেখান। তখন গানের শুরুতে জল স্থির অর্থাৎ, সুপ্রিয়ার মনেও যন্ত্রণা তখন জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু গান শেষ করার সাথে সাথে সুপ্রিয়া জোরে কেঁদে ওঠে ‘কী করবো আমি’ বলে এবং তখন ক্যামেরাম্যান দেখান, কুয়োর জলে ঢেউ উঠেছে এবং সেই ঢেউ-এ সুপ্রিয়ার প্রতিচ্ছবি দোদুল্যমান।[৮] অর্থাৎ, এখানে এই দৃশ্যের মধ্যে সুপ্রিয়ার চিত্তচাঞ্চল্যকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিয়ার গান হেরম্ব শুনতে পাচ্ছে এবং তার কান্না সে উপলব্ধি করতে পারছে। উপন্যাসেও হেরম্ব সুপ্রিয়ার এই চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছিল। এই দৃশ্যরূপ খুব চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে দর্শকদের সামনে।

আবার, সুপ্রিয়া ও হেরম্ব যখন মাঠে বেড়াতে যায়, তখন একটি চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে — দৃশ্যটি একটি গাছ কাটা হচ্ছে।[৯] দৃশ্যের শুরুতে গাছের কাণ্ডটি কুঠারের সাহায্যে কাটা হচ্ছে ও সুপ্রিয়া হেরম্বের কাছে তার স্ত্রী উমার মৃত্যুর খবর জানতে চায়। সুপ্রিয়ার মনে এতদিন ধারণা ছিল উমা তার আর হেরম্বের ভালোবাসার কথা জানতে পেরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এই বদ্ধমূল ধারণার প্রতীক হিসেবে গাছটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। শেষে যখন সুপ্রিয়া জানতে পারে উমা তার কথা জানত না, তখন গাছটি কেটে পড়ে[১০] অর্থাৎ, সুপ্রিয়ার মনের ভ্রান্ত ধারণাটিও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আবার, অশোক ও বীরসার কথোপকথন এবং সুপ্রিয়া ও হেরম্বের কথোপকথন একইসাথে দেখিয়ে অনবদ্য এক ভাববাহী আবহ তৈরি করা হয়েছে চলচ্চিত্রে।[১১]

আবার যখন হেরম্ব সুপ্রিয়াকে কেন সত্যি কথা বলতে পারল না(অর্থাৎ, তাদের দুজনের পথ আলাদা) এবং তা বলতে না পেরে সে চলে যেতে চেয়েছে, তখন দেওয়ালে টিকটিকিটাও দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে[১২] — এটা অসাধারণ রূপকাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতিমুখর আনন্দ চরিত্রটিকে প্রকৃতির মধ্যে দিয়েই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে।[১৩] উপন্যাসের শেষে আনন্দ আগুনে আত্মাহুতি দেয়।[১৪] সেখানে হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু, চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে আনন্দ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মারা যায় এবং হেরম্ব তাকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।[৫] মৃত্যুমুখী মানুষকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনা দরকার — এই বার্তা দর্শকমনে সঞ্চার করার জন্য এই দৃশ্যের সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিমল ভৌমিক,[১৬] যা উপন্যাসের অভিপ্রায়কেই ব্যক্ত করেছে। উপন্যাসের ভূমিকাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> “চরিত্রগুলি কেউ মানুষ না, মানুষের projection — মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।”[১৭]

চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলিও তাই হয়ে উঠেছে। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (সুপ্রিয়া), বসন্ত চৌধুরী (হেরম্ব), অঞ্জনা ভৌমিক (আনন্দ), অনুভা গুপ্ত (মালতী), কানু ব্যানার্জী (মাস্টারমশাই)[১৮] — প্রত্যেকের সুচারু অভিনয়ে চলচ্চিত্রটি উপন্যাসের এক দারুণ নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

এই চলচ্চিত্রটি দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় — ১. দ্বিতীয় সেরা ফিচার ফিল্মের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২. শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার — মাধবী মুখোপাধ্যায়।[১৯]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত আঞ্চলিক ভাষায় লেখা উপন্যাস ‘পদ্মা নদীর মাঝি’। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই উপন্যাসটি তৎকালীন পূর্ববাংলার শহর থেকে দূরে অবস্থিত নদীবেষ্টিত গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত। গ্রামের দীন-দরিদ্র জেলে মাঝিদের জীবনযাত্রার চিত্র অর্থাৎ, তাদের হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ — যা প্রকৃতিগতভাবে তাদের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ — তা এখানে খুবই মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন ঘটে ১৯৯৩ সালে। ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রের পরিচালক গৌতম ঘোষ ও প্রযোজনা করেন হাবিবুর রহমান খান। এই চলচ্চিত্রের প্রযোজনা কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন আশীর্বাদ চলচ্চিত্র।

‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করতে গিয়ে পরিচালক গ্রামীণ হতদরিদ্র মানুষ ও তার উপযুক্ত পরিবেশ এবং পদ্মানদীকে নির্বাচন করেছেন। উপন্যাসের প্রথমাংশে বর্ণিত হয়েছে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুমের কথা

আর অঙ্কিত হয়েছে তার প্রেক্ষাপট। এই অংশটি খুবই যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে চলচ্চিত্রে ক্যামেরার চোখে। রাত্রির অন্ধকার, অজস্র জেলে-নৌকা, তাদের হাতের আলো, মাছের চকচকে রঙ, হৈ-হুল্লোড় — সবমিলিয়ে পদ্মার বুকে মাঝিদের জীবনযাত্রার ছবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রাসুর ময়নাদ্বীপ ছেড়ে কেতুপুরে ফিরে আসা, ফিরে আসা রাসুর দেহভঙ্গি, তার পোশাক পরিচ্ছদ, তাকে ঘিরে গ্রামের মানুষের কৌতূহল, উত্তেজনা, রাসুর মামা পিতমের হাঁটা-চলা, কান্না, রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের ভয়ংকর রূপবর্ণনা, হোসেন মিয়াকে ঘিরে গ্রামের মানুষের বৈঠক, বৃষ্টির রাতে কুবেরের ঘরে হোসেনের আসা এবং রাতে থাকা, মালার সন্তানদের গল্প বলা ইত্যাদি চিত্র অসাধারণ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে চলচ্চিত্রে।

মালার সাথে পিসিমাও গল্প বলে — এই গল্প বলা সিনেমায় এক নতুন সংযোজন। এর মাধ্যমে প্রাচীনার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পিতৃদেশে আগত বন্যার কথা শুনে মালার কান্না, বন্যার ভয়ংকর চিত্রাঙ্কন, পিতমের রাসুকে তাড়ানোর দৃশ্য, শীতল ও যুগীর সুখী সংসারের বর্ণনা, শীতলের বাড়িতে কুবেরের টাকা আনতে আসার দৃশ্য, গ্রামের রূপকল্প, গোপী ও রাসুর কথোপকথন, পদ্মার বুকে ঝড়ে নৌকা ভাসা, ঝড়,জেলে মাঝিদের ঘর-বাড়ি তছনছ হয়ে যাওয়া, গ্রামের মানুষদের কাতরতা ইত্যাদি দৃশ্য খুব মর্মন্তুদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কুবেরের মনে কপিলার প্রতি জেগে ওঠা ভালোবাসার সূচনা, কপিলার কুবেরকে ঘিরে রসিকতার দৃশ্য ও নদীর জলে জোয়ারের দৃশ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে।[২০]

প্রিয়জনদের ফিরে আসার আশায় অপেক্ষারত গ্রামবাসীরা। একে একে ফিরে আসে সবাই। বাড়ি ফিরে কুবের যখন দেখে গোপীর পায়ে চালা ভেঙে পড়েছে এবং মালা মর্মস্পর্শী শোকে মূহ্যমান, তখন কুবেরের মুখে অতীতের দুঃখের গল্প বর্তমানে ইতিবাচক আশা জাগায়। ঝড়ের পরে মেজকর্তা ও হোসেনের গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানো, দুর্গাপুজোর দৃশ্য, কপিলাকে মেজকর্তার সাথে গল্প করতে দেখে কুবেরের রাগ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গোপীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, কপিলাকে তার স্বামীর আনতে আসা, আমিনুদ্দির গ্রাম ছেড়ে ময়নাদ্বীপে চলে যাওয়া, মালার হাসপাতালে যাওয়া, মালা ও কুবেরের ঝগড়া এবং পুনর্মিলন, কুবেরের কপিলার বাড়ি যাওয়া, পিতমের ঘরে চুরি, কিছুদিন পরে কুবেরের গৃহে পিতমের চুরি যাওয়া সম্পত্তি পাওয়া এবং হোসেন মিয়ার কথায় কুবের ও কপিলার ময়নাদ্বীপে চলে যাওয়া ইত্যাদি দৃশ্য উপন্যাস অনুযায়ী সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রতিটি বর্ণনা, চিত্রকল্প চলচ্চিত্রে সুসামঞ্জস্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের একটি স্থানে আছে —

> “এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়।”[২১]

— এই চিত্রকল্পটি সেইভাবে পরিস্ফুট হয়নি চলচ্চিত্রে।

এই চলচ্চিত্রে কয়েকটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন — “জীবনটা কাটাইলাম পরের ঘরে সুজন বন্ধু রে,”[২২] “মাঝি বাইয়া যাও রে,”[২৩] “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি,”[২৪] “পবন বয় বয়,”[২৫] “পরান আমার বাইরাম”[২৬] ইত্যাদি গানগুলি অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

উপন্যাসের চরিত্র ও চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলি একইভাবে পরিণত। উপন্যাসের সবচরিত্রই চলচ্চিত্রে উপস্থিত এবং তাদের অভিনয়-দক্ষতাও অসামান্য রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ (কুবের), চম্পা (মালা), উৎপল দত্ত (হোসেন মিয়া), রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (কপিলা), রবি ঘোষ (আমিনুদ্দীন), হুমায়ুন ফরীদি, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিমল দেব, আজিজুল হাকিম, আমিনুল হক চৌধুরী, মুক্তি আনোয়ার, রাসুল ইসলাম, তন্দ্রা ইসলাম, মমতা শঙ্কর, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ।[২৭]

সর্বোপরি, অভিনেতাদের অভিনয়-দক্ষতা, সুর-তালসহ গানের ব্যবহার, চিত্রকল্পের উপযুক্ততা, নৃত্যের ভঙ্গিমা, চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালকের সুদক্ষ পরিচালনা — সবকিছু মিলিয়ে চলচ্চিত্রদুটি সাফল্যমণ্ডিত ও শিল্পসম্মত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি ভিন্ন শিল্পমাধ্যম। সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে পারে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মানুষ। কিন্তু, চলচ্চিত্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত — সকল মানুষের মনেই রসসঞ্চার করতে পারে। এমনকি, বাংলা ভাষায় নির্মিত

চলচ্চিত্র বাংলা ভাষা না জানা মানুষও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে যদি জানতে চাওয়া হয়, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী? উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে শৈল্পিক ও সার্থক হলেই তা গ্রহণীয়।

Reference:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Dibratrir_Kabya, ১৩.০৪.২০২৬, সময় ৫.৩০ pm

২. https://youtu.be/NfLWmrSjR4Q?si=XnAdnYWJ68RfowVC, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১০.৪০ মিনিট – ১১.০৬ মিনিট।

৩. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১৭.৪৯ মিনিট।

৪. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৩২.০০ মিনিট।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, দিবারাত্রির কাব্য, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃ. ৩

৬. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১২.২০ মিনিট।

৭. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬,সময় ১২.৪৭ মিনিট।

৮. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১৫.৪৭ মিনিট।

৯. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১৮.০০ মিনিট।

১০. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১৯.৪৫ মিনিট।

১১. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ২৯.৫০ মিনিট।

১২. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৩১.১৭ মিনিট।

১৩. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৩৫.২৫ মিনিট।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, দিবারাত্রির কাব্য, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃ. ২০২-২০৩

১৫. https://youtu.be/NfLWmrSjR4Q?si=XnAdnYWJ68RfowVC, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১. ১৯. ৫০ ঘণ্টা।

১৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Dibratrir_Kabya, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৬.০৭ pm

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, দিবারাত্রির কাব্য, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৪৩

১৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Dibratrir_Kabya, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৮.০০pm

১৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Dibratrir_Kabya, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৮.০৫pm

২০. https://youtu.be/WmBdjNVBfAU?si=26J2Yr7MJ61ZxLSA, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ১.৪০ মিনিট।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মা নদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ১২৮

২২. https://youtu.be/WmBdjNVBfAU?si=26J2Yr7MJ61ZxLSA, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৪.২০ মিনিট।

২৩. ঐ,১৪.০৪.২০২৬, সময় ২৯.২৮ মিনিট।

২৪. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ২.০৩.০৪ ঘণ্টা।

২৫. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৪৯.৩২ মিনিট।

২৬. ঐ, ১৪.০৪.২০২৬, সময় ৩৮.২৪ মিনিট।

২৭.https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A6%BF_(%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0), ১৫.০৪.২০২৬, সময় ৬.৩০ pm